এক দশকে কতটুকু এগিয়েছে বাংলাদেশের সফটওয়্যার শিল্প?

আ মি নূ ল মো হা য় মে ন

এক দশক আগে বাংলাদেশে সফটওয়্যার শিল্প যাত্রা শুরু করেছিল অমিত সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। সে সময়েই প্রতিবেশী দেশটি সফটওয়্যার রফতানীর মাধ্যমে বছরে আয় করছিল এক বিলিয়ন ডলার বা পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশী (১৯৯৬-৯৭)। নয় বছরের ব্যবধানে ২০০৫-০৬ সালে তা ২০ বিলিয়ন ডলার ও মোট রফতানী বাণিজ্যের ১৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। গার্মেন্টস বা অন্যান্য রফতানীমুখী শিল্প অপেক্ষা এ শিল্পের রফতানী আয় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক বেশী ভূমিকার রাখতে পারে। তৈরী পোষাক থেকে রফতানী আয়ের ৬০ শতাংশেরও বেশী বিদেশে চলে যায় মেশিনপত্র ও কাঁচামাল আমদানিতে। বাকী ৪০ শতাংশের মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশের মত ব্যয় করা হয় কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধা বাবদ। ফলে এ খাতের রফতানী আয়ের মাত্র এক দশমাংশের মত দেশের সাধারণ মানুষের পকেটে যায়। অপরদিকে সফটওয়্যার শিল্প পুরোপুরি বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম নির্ভর হওয়ার কারণে এবং এর তেমন কোন কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতি না থাকায় এ শিল্প থেকে আয়ের প্রায় পুরোটাই দেশে থেকে যায়। তাছাড়া এ শিল্পের কর্মীরা উচ্চ শিক্ষিত ও দক্ষ হবার কারণে তুলনামূলক উচ্চ বেতন পেয়ে থাকে। ফলে সফটওয়্যার শিল্প থেকে অর্জিত রফতানী আয় অল্প কয়েকজনের হাতে আটকে না থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার রাখে।

বহির্বিশ্বে দেশের ইতিবাচক ইমেজ তৈরীতেও সফটওয়্যার শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সাধারণতঃ কোন একটি বা গুটিকয়েক বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি দেশের ইমেজ গড়ে তোলা হয় এবং তার আড়ালে অন্য সকল বিষয় চাপা পড়ে যায়। আমাদের পাশ্ববর্তী দেশটি কুসংস্কার, বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা ছাড়াও চরম অর্থনৈতিক বৈষম্যে জর্জরিত। এখনও সেখানে নারীদেরকে ধর্মের নামে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়, প্রায়শঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় হত্যা করা হয়, তাদের নারীদেরকে ধর্ষণ করা হয় ও তাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং নির্বাচনের ইস্যু হিসাবে সংখ্যালঘুদের ঐতিহ্যবাহী উপাসনালয় ধ্বংস করা হয়। এখনও সেখানে দারিদ্রের কারণে কৃষকরা দলে দলে আত্মহত্যা করে। কিন্তু সে সব কিছুকে চাপা দিয়ে দেশটির একটি আধুনিক ও জাজ্বল্যমান ইমেজ তৈরীতে মূল ভূমিকা রাখছে সে দেশের সফটওয়্যার শিল্প।

গত এক দশকে বাংলাদেশে সফটওয়্যার শিল্প বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। দেশে বর্তমানে ৩০০ এরও বেশী নিবন্ধনকৃত সফটওয়্যার কোম্পানী রয়েছে। সেগুলোতে ৪০০০ সফটওয়্যার কর্মী কাজ করছে। এ খাত প্রতি বছর রফতানীর ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। ২০০০-০১ অর্থবছরে যেখানে সফটওয়্যার রফতানী থেকে আয় ছিল ২.২৪ মিলিয়ন ডলার সেখানে ২০০৪-০৫ এ তা দাড়ায় ১১ মিলিয়ন ডলার। ৫০টির মত সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, মধ্যপ্রাচ্য, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে সফটওয়্যার রফতানী করে থাকে। কিন্তু তার পরেও তা আমাদের মোট রফতানী আয় ১০.৫ বিলিয়ন ডলারের মাত্র ১০০০ ভাগের এক ভাগ।

এ শিল্পে আশানুরূপ অগ্রসর হতে না পারার প্রধান কারণ কর্মী ও কর্মসংস্থান সংকটের এক ধরণের চক্রাকার সমস্যা। প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক সফটওয়্যার প্রস্তুতের কাজ আমরা পাচ্ছি না, তার প্রধান কারণ আমাদের

দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ সফটওয়্যার কর্মী নেই। নিয়োগকারীরা দক্ষ সফটওয়্যার ডেভেলপার খুজতে গিয়ে প্রায় সময়েই বিপাকে পড়েন। অপরদিকে কম্পউটার সায়েন্স পাশ করা প্রচুর তরুণ-তরুণী বেকার রয়েছে যারা তাদের কাঙ্খিত মানের কাজ পাচ্ছে না। কাজ না পাবার কারণে তাদের মধ্যে দক্ষতা তৈরী হচ্ছে না।

পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ কর্মী তৈরী না হবার পিছনে নিম্নোক্ত কারণগুলো কাজ করছেঃ

১. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে কম্পিউটার প্রকৌশল বা কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ থেকে যারা পাশ করে বের হয় তাদের মান ভালো থাকলেও সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম। যেমন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বছরে মাত্র ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে কম্পিউটার প্রকৌশলী হিসাবে তৈরী করতে পারে। এ শূন্যতা পূরণ করতে প্রচুর সংখ্যক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও ইনস্টিটিউট কম্পিউটার বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েশন ও ডিপ্লোমা দিচ্ছে। বছরে যে ৩০০০ গ্রাজুয়েট বের হচ্ছে তাদের সিংহভাগ আসছে এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে। অপ্রিয় শোনালেও সত্য যে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যারা মেধার প্রতিযোগিতা করে ভর্তি হতে পারছে না যেসব ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে ভর্তি হয়। ফলে তাদের একটি বড় অংশের মেধা ও বুনিয়াদি শিক্ষা এমন পর্যায়ের থাকে না যা দিয়ে তারা কম্পিউটার বিজ্ঞানের মত বিষয় আত্মস্থ করতে পারে। তদুপরি এ সকল প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কঠোরভাবে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; কেননা, কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে যে ছাত্রটি পড়াশোনা করছে সে ফেল করাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটিতে ছাত্র ভর্তি কমে যেতে পারে। ফলে এসকল গ্রাজুয়েটদের একটি বিরাট অংশ ডিগ্রি পাচ্ছে বটে কিন্তু যা শেখার কথা তা শিখতে পারছে না।

২. আমাদের দেশে লেখাপড়ার পদ্ধতি এমন নয় যা পঠিত বিষয়ের উপর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দক্ষ করে তোলে। একজন তরুন ইংরাজীতে মাস্টার্স করেছে বলেই যে ইংরাজী সাহিত্যে সে খুব ভালো হবে তার কোন নিশ্চয়তা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দেয় না। কেননা এখানে পরীক্ষার আগে কয়েকটি প্রশ্ন মুখস্থ করলেই পাশ করা যায়। এর কারণে যে পেশাগত জীবনে তেমন সমস্যায় পড়তে হয় তা নয়। সরকারী চাকুরীতে তো পেশাগত কাজের সাথে পঠিত বিষয়ের কোন যোগসূত্রই রাখা হয় না। কিন্তু সফটওয়্যার ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত পেশায় পঠিত বিষয়ের পুরোটাই প্রয়োগ করতে হয়। অন্য খুব কম ক্ষেত্রেই পঠিত বিষয়কে এতো নিখুত ভাবে পেশাগত জীবনে বাস্তবে প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে। তাছাড়া পেশাগত জীবনে এখানে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় আত্মস্থ করতে হয়। পাঁচ বছর আগে সফটওয়্যার শিল্পে যে প্রযুক্তি চালু ছিল তা এখন অচল হয়ে গেছে। ফলে দেখা যায় পরীক্ষায় ভালো ফল করেও অনেক সফটওয়্যার কর্মী পেশাগত জীবনে ভালো করতে পারে না।

৩. এদেশের সফটওয়্যার কর্মীরা ব্যক্তিকেন্দ্রীকতার কারণে কর্মক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়। আমরা সাধারণতঃ অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রীক পারিপাশ্বিকতায় বেড়ে উঠি। রাজনীতি ও সাহিত্যের মত পেশাগত জীবনেও ব্যক্তিকেন্দ্রীকতাকে আমরা সহজে কাটিয়ে উঠতে পারি না। সফটওয়্যার শিল্পের জন্য এর চেয়ে মত বড় শত্রু নেই। এখানে ব্যক্তি নয় দল হিসাবে কাজ করতে হয়। একজন যে কাজ করছে তা অন্যের কাজের সাথে পুরোপুরি খাপ না খেলে সফটওয়্যারটি কাজ করবে না। বিষয়টি অনেকটা একটি সনেটের ১৪টি ছত্র ১৪ জনে রচনা করার মত। অন্যের থেকে নিজের ভিন্নতা কিংবা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গেলেই বিপত্তি। কোন সফটওয়্যার কর্মী যত দক্ষই হোক না কেন, ব্যক্তি কেন্দ্রীকতার কারণে সে পুরো টিমের কাজের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

৪. সফটওয়্যার শিল্পের সাথে নির্মান শিল্পের কিছুটা মিল রয়েছে। অশিক্ষিত রাজমিস্ত্রিরাই আকাশ চুম্বী অট্টালিকা নির্মান করতে পারে কারণ অভিজ্ঞ স্থপতিরা সেগুলোর স্থাপত্য নকসা তৈরী করে দেন, উচ্চ শিক্ষিত প্রকৌশলীরা স্টাকচারাল ডিজাইন করেন এবং অভিজ্ঞ প্রকৌশলীরা নির্মানের প্রতি পর্যায়ে মান নিশ্চিত করার কাজ করেন। একটু বড় ও জটিল সফটওয়্যার তৈরী করতে গেলেও এরকম সফটওয়্যার স্থপতি প্রয়োজন, প্রয়োজন অভিজ্ঞ ডিজাইনার, মান নিশ্চিতকারী ও ব্যবস্থাপক। মাত্র কয়েকজন দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রযুক্তিতে হালনাগাদ সফটওয়্যার স্থপতি ও ডিজাইনার এবং শক্তিশালী মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকলে একটি প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীকে দিয়ে বিশ্বমানের জটিল সফটওয়্যার তৈরী করতে পারে।

আমাদের দেশে তথ্য প্রযুক্তি কর্মীদের বেতন কাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একজন অভিজ্ঞ সফটওয়্যার ডেভেলপার সফটওয়্যার শিল্পে কাজ করলে যে পরিমাণ বেতন পান, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পদে বা বিভিন্ন প্রকল্পে পরামর্শক হিসাবে তার থেকে বেশী আয় করেন। ফলে অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে সফটওয়্যার শিল্প থেকে কর্মীরা দূরে সরে যেতে থাকে। এর ফলে সফটওয়্যার স্থপতির মত পদে কাজ করার মত সফটওয়্যার ডেভেলপার পাওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

৫. আমাদের উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীটির মধ্যে বিদেশে পাড়ি জমানোর যে প্রবণতা রয়েছে এ শিল্পে তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে। দক্ষ সফটওয়্যার কর্মীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশে চলে যাচ্ছে। এক সময়ে মনে করা হয়েছিল যে সফটওয়্যার কর্মীদের এই অংশটি দেশের সফটওয়্যার পণ্য বিপননে ভূমিকা রাখতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে সে রকমটি ঘটেনি।

৬. কর্মী ও কর্মসংস্থান সংকটের এ চক্রাকার সমস্যার পিছনে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখছে দেশে অবৈধভাবে কর্মরত অসংখ্য ভারতীয় সফটওয়্যার কর্মী। বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী বাংলাদেশে লক্ষাধিক ভারতীয় নাগরিক অবৈধভাবে কাজ করছে। তাদের একটি অংশ সফটওয়্যার শিল্পে কাজ করছে। দেখা যায় একই যোগ্যতার একজন ভারতীয় ও একজন বাংলাদেশী কর্মী থাকলে নিয়োগকর্তারা ভারতীয়কেই পছন্দ করেন। সফটওয়্যার শিল্পে দেশটির অগ্রগতির কারণে তারা সহজেই নিয়োগকারীদেরকে প্রভাবিত করতে পারে। এ সকল কর্মীরা অনেকক্ষেত্রে পরিকল্পিত উপায়েই এ দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতের ক্ষতি সাধন করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

কর্মী ও কর্মসংস্থানের সমস্যা চক্রটির অপরদিকে রয়েছে বিপননে দুর্বলতা। বিদেশে সফটওয়্যার রফতানীর ক্ষেত্রে সব থেকে বেশী সমস্যায় পড়তে হয় বিপননের ক্ষেত্রে। রফতানীর ক্ষেত্রে রেডিমেড সফটওয়্যার পণ্যের বাজার নেই বললেই চলে। বরং বিদেশী ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী সফটওয়্যার পণ্য তৈরী করে দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে বিদেশী ক্রেতাকে নিশ্চিত হতে হবে যে এ দেশী প্রতিষ্ঠানটি তার প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সঠিক মানসহ তৈরী করে দিতে পারবে। এ ধরণের নিশ্চয়তার জন্য দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও পরিচয়ের বিকল্প নেই। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বড় বড় তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদসমূহে প্রতিবেশী দেশটির নাগরিকেরা কাজ করছে। দেশটির সফটওয়্যার শিল্প বিকাশে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া সে দেশের প্রধান প্রধান শিল্প গোষ্ঠীগুলো এ শিল্পে বিনিয়োগ করায় বিদেশে তাদের বিপনন অফিস খুলতে পারছে এবং তার মাধ্যমে প্রচুর কাজ দেশে আনতে সক্ষম হচ্ছে। আমাদের বিপননে দুর্বলতার পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে বিপননের পিছনে বিনিয়োগের অভাব। এদেশের বড় বড় শিল্পগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ীরা সফটওয়্যার শিল্পে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে আসছে না। সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান অতি অল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে

যাত্রা শুরু করে। তাদের পক্ষে বিদেশে অফিস খুলে বিপনন কার্যক্রম চালানো সম্ভব হয় না। সরকারের পক্ষ থেকে এ ক্ষেত্রে কিছুটা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং তা বেশ সফলও হয়েছে।

বিদেশে বিপননের ক্ষেত্রে দেশের ইমেজের বিষয়টিও ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশকে মৌলবাদী, জঙ্গীবাদের ঘাটি ইত্যাদি হিসাবে বিদেশে পরিচিত করতে আমাদের প্রবাসীদের একটি অংশটি যেভাবে তৎপর, দেশের সমৃদ্ধ, সম্ভাবনাময় ও কীর্তিমান রূপটি প্রতিষ্ঠা করতে তাদের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না।

কর্মী ও কর্মসংস্থান সংকটের বৃত্তাকার সমস্যা মোকাবেলার জন্য সফটওয়্যার শিল্পের নেতৃবৃন্দ সাম্প্রতিক সময়ে সরকারী দফতরে সফটওয়্যারের ব্যবহার বাড়ানোর কথা বলছেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, যেহেতু পর্যাপ্ত কাজ ছাড়া দক্ষ কর্মী গড়ে তোলা সম্ভব নয় এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ কর্মী ছাড়া ব্যাপক ভিত্তিতে বিশ্বমানের সফটওয়্যার তৈরী সম্ভব নয় তাই সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে বিভিন্ন সরকারী দফতরে সফটওয়্যার ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে এ বৃত্ত থেকে বের হবার। তবে তাতে জনগণের অর্থ অপচয়ের আরও একটি সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে বলে অনেকেই সন্দিহান। যেমন ৮৩.১৬ কোটি টাকা দিয়ে ই-গর্ভনেন্স চালু সংক্রান্ত একটি সরকারী প্রকল্প ইতোমধ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে ই-গর্ভনেন্স চালুর জন্য। বিটিটিবি সহ বেশ কিছু দফতরে ইতোমধ্যে ই-গর্ভনেন্স চালু করা হয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা বা সেবার কোন উন্নতি হয়নি। ঘুষ না দিয়ে এখন কি বিটিটিবির ল্যান্ড ফোন সংযোগ পাওয়া যাচ্ছে? আপনার ফোনে কোন সমস্যা হলে ইন্টারনেটে গিয়ে অভিযোগ করলে কি কোন লাভ হচ্ছে? এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে স্বচ্ছতা আনার উদ্দেশ্য নিয়ে গৃহীত উক্ত প্রকল্পটি নিজেই নূন্যতম স্বচ্ছতা দেখাতে পারছে না। তাদের একটি ওয়েব সাইট রয়েছে। কিন্তু তাতে তাদের কর্মকান্ডের ব্যাপারে তেমন কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। প্রকল্পটি কত টাকার, এ পর্যন্ত কি কি কাজ করেছে এবং তাতে কত খরচ হয়েছে ইত্যাদি তথ্যাদি থাকাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক হলেও তারা তা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করছে না। এর বাইরেও অনেকগুলো প্রকল্প রয়েছে বিভিন্ন সরকারী খাতকে কম্পিউটারীকরণের লক্ষ্যে। সে সকল প্রকল্পের অধিকাংশই কাঙ্খিত ফলাফল দিতে পারছে না। তাই সফটওয়্যার ব্যবসায়ীদের ও দাবীর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সফটওয়্যার শিল্পের সমস্যচক্র ভাঙ্গতে সরকারকে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে চেষ্টা করতে হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার সায়েন্স ও প্রকৌশল বিভাগে বেশী সংখ্যায় ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা করলে দক্ষ কর্মী সংকট সমাধানের পথ অনেকটাই উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এ জন্য প্রয়োজন হলে চাকুরী ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের চাহিদা কম সে সকল বিষয়ের সিট সংখ্যা কমাতে হবে। দলবদ্ধভাবে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তোলার বিষয়টির দিকে শিক্ষকগণ বিশেষভাবে নযর দিতে পারেন। তাছাড়া সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকেও বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তাদের কর্মীদের মধ্যে দলবদ্ধভাবে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। বিপননের বাধা দূর করতে সরকারকে যেমন আরও উদ্যোগ নিতে হবে তেমনি চেষ্টা করতে হবে বড় বড় শিল্পোদোক্তাদেরকে এ শিল্পে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার।